



পান সুপারির চাষ

পান-সুপুরির চাষ

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়, এম. এস.-সি. (এজি.)

দি বুক ট্রাস্ট

৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
অলক মুখোপাধ্যায়
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৫

মূল্য : তিন টাকা

এতে পাবেন

পান ও সুপুরির দেশভেদে নাম
পান ও সুপুরির ভেষজ গুণ
পান ও সুপুরির বিভিন্ন ব্যবহার
পান ও সুপুরির চাষ প্রণালী
পান ও সুপুরির রোগ পোকা দমন
পান ও সুপুরি চাষের অর্থকরী দিক

মুদ্রাকর :
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

পান-স্থপুরী বাঙ্গালী গৃহস্থের নিত্য সঙ্গী। ধর্ম-কর্ম সামাজিক অনুষ্ঠান, অতিথি আপ্যায়ন, সবই পান-স্থপুরী বিনা অচল। প্রসাধন এবং রোগ নিরাময়েও পানের মূল্য অসীম। তাই পান-স্থপুরী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেদিক থেকে বিচার করলে পান-স্থপুরী চাষের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের কথা পান-স্থপুরীর চাষকে এখন ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সুখের বিষয় শ্রীধীরেন রায়, এম. এস. সি. (এগ্রি.), পান-স্থপুরির চাষের উপর সহজ ভাষায় এই বইটি লিখেছেন। শুধু পান চাষী নন, গৃহস্থ মানুষেরাও বাড়িতে দু-একটা পান-স্থপুরির গাছ লাগাতে চাইলে বইটি থেকে অনেক খবর পেয়ে যাবেন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অরুণকুমার মিত্র
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
চুঁচুড়া, হুগলী

পান

পরিচিতি ঃ

লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত, পাতা ৩" থেকে ৮" লম্বা, ডিম্বাকৃতি, ডগা সরু। বোঁটার দিকে হৃদপিণ্ডের মত, বোঁটা ১/২" থেকে ২" লম্বা, পুংদণ্ড ৩" থেকে ৬" লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ১/৬ থেকে ১/৮" শাঁসযুক্ত। স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

সংস্কৃত ভাষায় পানের নাম ঃ

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী, নাগবল্লরী।

দেশেভেদে পানের নাম ঃ

বাংলায়—পান; উত্তর ভারতে—পান, নাগরবেল, পাত্তাই; মহারাষ্ট্রে—নাগবেল; অন্ধ্রে—তামলপাকু; মাদ্রাজে—বেট্টিলী; গুজরাটে—নাগর বেল্য, পান; কর্ণাটকে—নাগরবল্লী; উৎকলে—পানবেল; পারস্যে—বর্গংতবোল; আরবে—ফান।

পানের ভেষজ গুণ ঃ

ভেষজ বিজ্ঞানীদের মতে পানের দশটি গুণ আছে, যেমন—অম্ল, তিক্ত, উত্তেজক, মিষ্ট, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা, কৃমি ও মুখের দুর্গন্ধনাশক। পান খেলে মুখ পরিষ্কার হয়। প্রাচীন বৈদ্যদের মতে সকালে আহারের পরে এবং রাতে শোবার সময় পান খাওয়া ভাল। সুশ্রুত বলেন, পান উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। পানের রস অন্যান্য ওষুধের অনুপানরূপে ব্যবহার হয়। পানের বোঁটায় রেড়ীর তেল মাখিয়ে শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করালে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান

কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়, ফোড়ায় লাগালে ফোড়া বসে যায় এবং স্তনে দিলে দুধ কমে যায়। পানের তেল গলা ফোলা এবং সর্দিতে হিতকর ; ইহার ফল মধুর সঙ্গে খেলে সর্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খেলে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না। চোখে যে কোন ধরনের যন্ত্রণা হলে পানের রস চোখে দিলে আরাম হয়। পানের রস চোখে দিলে রাতকানা রোগ সারে। সাতটি পান থেতো করে সামান্য সৈন্ধব লবণ সহযোগে গরম জলের সঙ্গে খেলে গোদ ভাল হয়। পানের তেল কফ, পীড়া স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। এক বিন্দু পান-তেলের অভাবে চারটি পানের রস সমান কাজের। পানের ভিতর জল নিয়ে অল্প আগুনে ধরে গরম করে তিনবার খেলে গলার বেদনা ভাল হয়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করলে স্তনের ফোলা কমে এবং দুগ্ধস্রাব কমে যায়। ক্ষতে পানের পাতা লাগালে ঘা শুকিয়ে যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে, লোকগাথা ও লোককাব্যে পান সমাদৃত। আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখি যে জন্মের শুরুতে যেমন পানের প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় মৃত্যুর পরে। মধ্যে সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নে পানের কদর যথেষ্ট। আবার নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভূরিভোজের পর একখিলি পান না হলে ভূরিভোজের সুখ যেন সম্পূর্ণ হয় না। তাম্বুল বিলাসীদের বিভিন্ন সুগন্ধি মসলার অনুপানসহ ঘন ঘন পান না হলে চলে না। এছাড়া পানের ভেষজগুণও কি কম। পুরাণে আছে পর্ণলতার ভেষজগুণে আকৃষ্ট হয়ে অর্জুন স্বয়ং স্বর্গের বাগান থেকে পর্ণলতা চুরি করে এনে নিজের বাগানে রোপণ করেছিলেন। এতে মনে হয় ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানীদের কাছে পানের ভেষজগুণের কথা অজানা ছিল না।

কিন্তু হিন্দুপুরাণে পানের উল্লেখ থাকলেও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে

পানের আদি নিবাস ছিল মালয়েশিয়ার স্যাঁতসেঁতে অরণ্য অঞ্চল; যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই পানের চাষ হয়ে আসছে। পশ্চিমবাংলার বারুজীবী সম্প্রদায় বাংলায় পানচাষের প্রাচীনত্বের নিদর্শন বহন করে।

জলবায়ু:

উষ্ণ-আর্দ্র ক্রান্তিয় বনাঞ্চল পানগাছের প্রিয় বাসস্থান। অর্থাৎ মাটিতে থাকবে পর্যাপ্ত রস, বাতাস হবে উষ্ণ-আর্দ্র, আর পারিপার্শ্বিক হবে ছায়া শীতল। এমন আদর্শ পরিবেশ পাওয়া যায় ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, সমুদ্রের ধার বরাবর। বম্বের পশ্চিমঘাট অঞ্চলের নিম্নভূমি আর আসামের পাহাড়ের পাদদেশে এই পরিবেশ রয়েছে। এসব অঞ্চলে, বনে জঙ্গলে ছায়াঘেরা স্থানে, সুপারি বাগানে পানের চাষ স্বাভাবিক পরিবেশে হয়ে থাকে।

কিন্তু পানের দৈনন্দিন বহুল ব্যবহার এবং যথেষ্ট ব্যবসায়ী মূল্য হেতু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃত্রিমভাবে পানচাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পানচাষ করা হয়ে থাকে। যেমন কেরলে, যেখানে বছরে ৯০″ থেকে ১৯০″ বৃষ্টিপাত হয়, কিংবা আসামের ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ী এলাকা, অথবা পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে গ্রীষ্মের সময় প্রচণ্ড গরম বাতাস প্রবলভাবে বয়ে যায়। এমনিভাবে দেখা যায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই কোন-না-কোনভাবে পান চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পানের চাষ করা হয়।

গরম ও শুকনো বাতাস পানগাছ সহ্য করতে পারে না, ডগা শুকিয়ে যায় এবং মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা সত্ত্বেও গাছ নেতিয়ে পড়ে। বাতাসের তীব্রতা বেশী হলে পানপাতা কলাগাছের পাতার মত ফেটে যায়। ফলে

বাজার দরও কমে যায়। আবার খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়লে পাতা ঝরে পড়ে। সাধারণতঃ ঐ ধরনের পরিবেশে পান চাষ করা হয় না, আর করা হলেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশ কৃত্রিমভাবে তৈরী করে পান চাষ করা হয়। চারিধারে এবং উপরের ছাউনিতে পাটকাঠি, খড় বা ঐ ধরনের সস্তা অথচ হাল্কা জিনিস দিয়ে একটি ঘরের মতো তৈরী করা হয়। চারিধারে বেড়াদেওয়া ছায়াঘেরা এই মনোরম পরিবেশকে চলতি কথায় বরোজ বলা হয়। বরোজের চাল এমনভাবে পাটকাঠি দিয়ে তৈরী করা হয় যাতে কিছুটা সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পায়।

মাটি ঃ

জৈবসারে পুষ্ট এবং ভাল জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ, কাদা দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ মাটি পান চাষের উপযুক্ত। লাল দো-আঁশ মাটিতেও উপযুক্ত পরিমাণে জৈবসার ও পলিমাটি মিশিয়ে পানের চাষ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পুকুর বা জলাশয়ের ধারে উঁচু জমি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল পতিত অবস্থায় পড়ে আছে এমন এঁটেল জমিও পান চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। পান চাষের জমি নির্বাচনের সময় একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে জমির ধারেপাশে যেন সেচের জলের উপযুক্ত উৎস থাকে।

লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি পান চাষের অনুপযুক্ত। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে লাল কাঁকুরে মাটি বা বালি মাটিতেও পান চাষ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্য জমি থেকে উর্বর মাটি কেটে এনে অনুর্বরা জমিতে ফেলে চাষের উপযুক্ত করা যেতে পারে। অনেক স্থানে পুরানো পুকুরের পাঁক-মাটি তুলে এনে জমিতে লাইন করে ফেলে জমির মাটির

সঙ্গে মিশিয়ে পানের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। উপযুক্ত মাটির সঙ্গে জমিতে একদিকে বা দুদিকে ঢাল থাকা চাই। স্বাভাবিক ঢাল না থাকলে জমি তৈরীর সময় জমির মাঝ বরাবর উঁচু রাখা হয়। এতে অতিরিক্ত জল সহজেই জমি থেকে বার হয়ে যেতে পারে। নীচু জমি পান চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

জাত ঃ

পান পাইপারেসি বংশজাত। বছরে লম্বায় ১০ থেকে ১৫ ফুট হতে পারে। এর গাঁট থেকে অস্থানিক মূল বের হয়, আর এই মূলের সাহায্যে অপর কোন গাছ বা অবলম্বনকে জড়িয়ে উপরে উঠে যায়। পাতা মসৃণ এবং দেখতে হৃদপিণ্ডের মত। জাত ভেদে আকার বিভিন্ন হয়ে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ গাছ পৃথক। ফুল ছোট এবং একমাত্র পুরানো গাছেই দেখা যায়।

জাতভেদে পাতার রং, গন্ধ ও স্বাদ আলাদা হয়ে থাকে। তবে পরিবেশের প্রভাবে পাতার আকার এবং স্বাদের কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় উৎপন্ন কিছু জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল।

এলাকা	জাত	বৈশিষ্ট্য
আসাম	খাসিপান	গাছ খুব বড় হয়, পাতাও আকারে বড়।
	অসমিয়া পান	মাঝারি স্বাদ বিশিষ্ট
	সাঁচিপান	গন্ধযুক্ত
	মিঠাপান	মিষ্টি স্বাদযুক্ত
	বাংলা পান	মোলায়েম

এলাকা	জাত	বৈশিষ্ট্য
উত্তর প্রদেশ	দেশীদেশভরি	পাতা পাতলা, ডগা লম্বা, শিরা লালচে বর্ণের, পাতায় আঁশ খুব কম, চিবিয়ে খাওয়ার পক্ষে মনোরম।
	দেশী বাংলা	দেশীদেশভরির তুলনায় পাতা মোটা, ডগা ছোট এবং ঝাঁঝ যুক্ত।
	কলকাত্তাই বাংলা	পাতা মোটা, লবঙ্গগন্ধ ও আঁশযুক্ত।
পশ্চিমবাংলা	ঢোলাডগা	আগে এর খুব নামডাক ছিল, তবে ঢলে পড়া রোগে সহজে আক্রান্ত হয় বলে এখন আর তেমন সমাদৃত নয়।
	ভুব্‌না	পূর্বে বাংলা পান নামে পরিচিত ছিল। রোগ সহনশীল। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই চাষ হয়।
	সাঁচি, মাঘি, মিঠা	এসব জাতের পান হাওড়া জেলায় বেশী চাষ হয়ে থাকে। অন্যান্য জেলাতেও কিছু কিছু চাষ হয়। বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সাঁচি বা মিঠা পানের মত। পশ্চিমবাংলায় ঐ সব জাত ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপজাতের চাষ হয়ে থাকে। স্থানভেদে তাদের নামও আলাদা।

এলাকা	জাত	বৈশিষ্ট্য
বোম্বাই	দেশীপান	নিম্নমানের সাদাপান।
	কালীপান	পাতা বড়, হৃদপিণ্ডের আকার-বিশিষ্ট, গাঢ় সবুজ বর্ণের, ঝাঁঝালো, ঢলেপড়া রোগ সহনশীল।
	নালেকার	লম্বা ও সুচালো, প্রচুর পাতা হয়, তবে সাধারণ মানের।
	কুড়ি	পাতা লম্বা, অনেক পাতা হয়।
মাদ্রাজ	কর্পূরকদি	সুগন্ধযুক্ত, মাঝারি মানের।
	ভেলতাকুদি, চিতুকুদি	পাতা পাতলা, সামান্য গন্ধযুক্ত।
	কাম্মেরা	পাতার আকার বড়, মোটা, খুব গন্ধযুক্ত।
	কাপ্পুরি	পাতা বড়, হালকা বর্ণের, সামান্য ঝাঁঝালো, অনেক দিন তাজা থাকে।
মহীশূর	কারিবাল্লি	পাতা গাঢ় সবুজ, মাঝারি আকার-বিশিষ্ট মোটা, ঝাঁঝালো। অনেকদিন তাজা থাকে। ফলন প্রচুর।
	আমবাদি	পাতা লম্বা, সরু, কর্পূর গন্ধযুক্ত, অনেকদিন তাজা থাকে।
	কানিগেল	পাতা ছোট ও সরু।

জমি তৈরী ঃ

চারা রোয়ার ২।৩ মাস আগে থেকে পানের জমি তৈরী করা চাই। প্রথমে লাঙ্গল দিয়ে মাটি চাষ পরে কোদাল দিয়ে গভীর ভাবে মাটি

কুপিয়ে নিতে হবে। কোদাল দিয়ে কোপানোর আগে প্রতি ডেসিম্যাল জমির জন্য দু-কেজি হিসাবে চুন প্রয়োগ করা ভাল। এতে মাটির ভৌত রাসায়নিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং মাটির মধ্যকার জীবাণুর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বর্ষার পরে চারা রোয়া করা হলে বর্ষার মুখে শন, ধৈঞ্চা ইত্যাদি সবুজ সারের চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। সম্ভব না হলে উপযুক্ত পরিমাণে জৈবসার জমি তৈরীর এক দেড় মাস আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে জমি তৈরীর পর জমিকে পাট (সমান) করে নিতে হবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমির মাঝ বরাবর উঁচু এবং দুপাশে ঢালু হয়। এতে জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং গাছের গোড়ায় জল বসার ভয় দূর হবে। এই অবস্থায় ২০—২৪ ইঞ্চি পর পর লাইন করে লাইনের উপর ৬।৮ ইঞ্চি চওড়া করে পুরানো পুকুরের পাঁক মাটি ফেলা যেতে পারে। এর সঙ্গে সম্ভব হলে বিঘায় এক থেকে দেড় কুইন্টাল হিসাবে গুঁড়া সরষের খৈল হাল্কাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে (একশত হাতে ২—২·৫ কেজি) মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। পরে লাইন বরাবর ৩।৪″ উঁচু করে ভেলী বা ৩।৪″ গভীর করে নালা কেটে নেওয়া হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

পানের জমি তৈরীর সময় প্রতি বিঘা জমিতে ৩০ থেকে ৫০ কুইন্টাল গোবর বা আবর্জনা পচা সার ব্যবহার করা দরকার। বর্ষার পরে পানের চারা রোয়া হলে বর্ষার শুরুতে শন, ধৈঞ্চা ইত্যাদি সবুজ সারের গাছ চাষ করা যেতে পারে। এতে মাটিতে জৈব পদার্থ এবং নাইট্রোজেন সার দুই যুক্ত হয়। এদের কোনটাই সম্ভব না হলে চারা রোয়ার ২

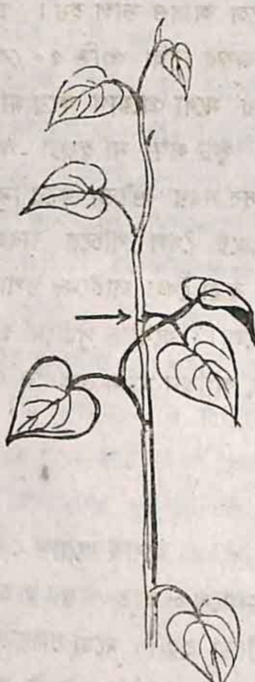
সপ্তাহ পূর্বে বিঘা প্রতি এক থেকে দেড় কুইন্টাল সরষের খৈল নালীতে বা ভেলীতে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। খৈলের সঙ্গে সামান্য ইউরিয়া বা অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার ব্যবহার করলে আরও ভাল হয়। চারা লাগানোর একমাস পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর বিঘা প্রতি ৫০ কেজি সরষের খৈল গাছের সারির দুধারে ৩।৪ ইঞ্চির মধ্যে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। লতা ৩।৪ ফুট লম্বা না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভাবে খৈল ব্যবহার করতে হবে। খৈল সব সময় গুঁড়ো করে নিতে হবে। বর্ষার সময় শুকনো এবং অন্যান্য সময়ে খৈল পচিয়ে ব্যবহার করা ভাল। বর্ষার সময় শুকনো গুঁড়ো করা খৈল লাইনের দুপাশে ছড়িয়ে সামান্য ঝুরা মাটি চাপা দিলেই চলে। বরোজ পুরানো হলে খৈলের পরিমাণ বাড়িয়ে বর্ষার আগে একবার, আশ্বিন মাসে একবার এবং পৌষমাসে একবার প্রয়োগ করলেই চলে।

বরোজ তৈরী ঃ

চারা রোয়ার আগে বা রোয়ার ৭।১০ দিনের মধ্যেই বরোজ তৈরী করা চাই। বরোজ তৈরীর জন্য জমির চারপাশে ৮ হাত অন্তর ৫ হাত লম্বা পাকা বাশের জাগ্ দেওয়া খুঁটি পোঁতা হয়। মধ্যে চলাচলের সুবিধার জন্য ২।৪ হাত অন্তর খুঁটি পুঁতে চালের কাঠামো তৈরী করা হয়। বরোজের বেড়া খড় বা শন দিয়ে এবং চালা পাটকাঠি দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে। পাটকাটি দিয়ে চালা তৈরীর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সূর্যের আলো খুব বেশী বরোজের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। বরোজের বেড়া বা চালের পাটকাঠি পচে গেলে বা উই ধরলে পালটে ফেলতে হবে।

চারা তৈরী ও রোপণ ঃ

পানগাছের কাণ্ডকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে চারা তৈরী করা হয়। পান লতার ডগাও ব্যবহার করা হয়। তবে যে কাণ্ড থেকে চারা তৈরী করা হবে তা যেন অন্ততঃ দুবছরের পুরানো হয়। এই ধরনের পুরানো লতার মাটি সংলগ্ন অংশের কিছুটা বাদ দিয়ে কাটিং বা চারা তৈরী করা উচিত। প্রতিটি কাটিং লম্বায় এক থেকে দেড় ফুট এবং ৩-৫টি গাঁট বা পাতা সমেত হওয়া চাই। প্রতিটি গাঁটে যথেষ্ট সংখ্যায় অস্থানিক মূল থাকা চাই। লম্বা কাটিংও বসানো চলে। সে ক্ষেত্রে কাটিং-এর গোড়ার দিকের বেশীর ভাগ কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়ে থাকে, ডগার দিকে কিছুটা মাটির উপর বেড়িয়ে থাকে।



চারা বা কাটিং
(তীর চিহ্নের নীচের অংশ মাটির মধ্যে পোঁতা হয়।)

গোড়াপচা রোগাক্রান্ত বরোজ থেকে চারা তৈরী করা উচিত নয়। যে অঞ্চলে ঢলে পড়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী সেখানে চারা রোয়ার আগে শোধন করে নেওয়া দরকার অথবা প্রথম সেচের সময়

সেচ নালার মধ্যে গুঁড়া করা তুঁতে রেখে সেচ দিলে উপকার হয়। কাপড়ের টুকরোর মধ্যে গুঁড়া করা তুঁতে বেঁধে সেচ নালার মধ্যে ফেলে রাখলেই চলে। চারা শোধন বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩।৪ ইঞ্চি গভীর নালীতে বা ৩।৪ ইঞ্চি উঁচু ভেলীতে ৬।৮ ইঞ্চি দূরে দূরে একদিকে সামান্য হেলান অবস্থায় চারা রোয়া হয়ে থাকে। রোয়ার পরে আঙ্গুল দিয়ে টিপে গোড়ার মাটি শক্ত করে দিতে হয়। এতে চারা তাড়াতাড়ি লেগে যায়। সাধারণভাবে দুটি গাঁট মাটির নীচে রাখা হয়, উপরের গাঁটের পাতা মাটির উপরে থাকে।

বড় লতা টুকরো করে চারা তৈরীর সময় কোন ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং লতা কাটার আগে শোধন করে নেওয়া ভাল। গাঁটের কিছুটা নীচে কলমের মত করে কাটা হয়ে থাকে।

চারা রোয়ার পরে বৃষ্টি না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প সেচ দেওয়া দরকার। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে চারা রোয়া হলে, রোয়ার পরেই পরিষ্কার খড় দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হয়। বিকালের দিকে খড় তুলে ঝারি দিয়ে সেচ দেওয়ার পরে আবার ঢেকে দিতে হয়। সাতদিন পর খড়গুলি পালটে নূতন খড় ব্যবহার করা হয় এবং ২০-২১ দিন পরে আর খড় দিয়ে ঢাকার প্রয়োজন হয় না। এসময়ে চারা রোপণ করতে হলে রোয়ার আগে জমিতে প্রয়োজনবোধে সেচ দিয়ে নিতে হতে পারে। জো এলে তবেই চারা রোয়া হয়।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারা সতেজ হয়ে ওঠে এবং এক মাসের মধ্যেই ডগায় নূতন কুঁড়ি বা পাতা দেখা দেয়। লতা ১০।১২ ইঞ্চি বড় হলেই লতার নীচের দিকের নোংরা, পচা পাতা ফেলে দিয়ে লতার অবলম্বনের জন্য ৮।৯ ইঞ্চি পর পর কাঠি পুঁতে তাতে এক একটি লতা আলতোভাবে

বেঁধে দিতে হয়। কাঠিগুলি যেন বরোজের চাল পর্যন্ত পৌঁছায়। কোন কোন স্থানে একটির পরিবর্তে তিনটি কাঠি ত্রিপায়ার আকারে পুঁতে কাঠির মাথাগুলি একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এতে কাঠিগুলি বরোজের ঠেকার কাজ করে।

পানের লতা নির্ভরদণ্ডের সঙ্গে ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি দূরে দূরে আলগাভাবে পাট বা কলাগাছের আঁশ দিয়ে বাঁধা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ১৫।২০ দিন অন্তর লতা বাঁধার দরকার হয়। লতা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর অস্থানিক মূল আশ্রয় দণ্ডকে আঁকড়ে ধরে, তখন আর লতার মাটিতে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

চারা রোয়ার সময় ঃ

বছরে তিন সময়ে চারা রোয়া চলতে পারে। যেমন, আষাঢ়-শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, ফাল্গুন-চৈত্র। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রোয়া হলে পরবর্তী আষাঢ-শ্রাবণ মাসে পান তোলার উপযোগী হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে রোয়া গাছে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পাতা তোলা যায়। তবে এ সময়ে রোয়া হলে সেচের প্রয়োজন হয়। মিঠাপানের চারা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এবং অন্যান্য সময়ে বাংলা বা অন্যান্য জাতের চারা রোয়া হয়ে থাকে। মিঠাপানের ক্ষেত্রে পুরো লতা বা গাছ রোয়া হয়ে থাকে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে রোদের তেজ কম থাকে, তাই গাছ বা চারা মরে যাওয়ার ভয় থাকে না।

পরিচর্যা ঃ

পানের বরোজ সবসময় পরিষ্কার রাখা দরকার। এমন কি পান গাছ এক ফুটের মত বড় হলেই গোড়ার দিকের পচা পাতা পরিষ্কার

করে ফেলা দরকার। এই সময়েই গাছের গোড়ায় কাঠি পুঁতে দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে পানের লতাকে ৯।১০ ফিটের বেশী লম্বা হতে দেওয়া হয় না। কারণ অতিরিক্ত লম্বা গাছ থেকে পাতা তোলা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি গাছ বেশী লম্বা হলে গাছের তেজ কমে যায় এবং পান পাতা ছোট হয়ে যায়। কাজেই পানের লতা বরোজের চাল বেয়ে লতাতে শুরু করলেই লতার নীচের পাতা তুলে নিয়ে লতাকে নীচের দিকে টেনে নামিয়ে দেওয়া দরকার। লতা নামিয়ে ৪।৬" ব্যাসবিশিষ্ট কুণ্ডলী তৈরী করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। চাপা দেওয়ার কাজে ঝুরো মাটি ব্যবহার করা দরকার। এই সময়ে গাছের দুপাশে খৈল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সেই মাটি দিয়ে কুণ্ডলী ঢেকে দেওয়া হয়। এছাড়া বর্ষার সময় বা পরে বৃষ্টির জলে গাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে গেলে গাছের দুপাশে খৈল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সেই মাটি গাছের গোড়ায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। একে পাশ দেওয়া বলে। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে খৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পানের লতাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটি চাপা দেওয়াকে সতেজীকরণ বলে। এই সতেজীকরণ পদ্ধতি প্রথম বছরে একবার। পরবর্তী সময়ে বছরে দুবার করা দরকার। মাটি চাপা দেওয়া লতা থেকে নতুন গাছ তৈরী হয়।

পানগাছে ফুল দেখা দিলেই তা নষ্ট করে ফেলা দরকার। তা নাহলে পান পাতা ছোট হয়ে যাবে। প্রথম বছরে ফলন কম হলেও দ্বিতীয় বছর থেকে গাছের সংখ্যা যেমন বাড়ে, ফলনও তেমনি বাড়তে থাকে।

লতা নামানোর কাজ বর্ষার শুরু এবং শেষ অনুসারে ভারতের বিভিন্ন

সময়ে করা হয়ে থাকে। তবে বর্ষার মধ্যে কখনই লতা নামানো উচিত নয়। বসন্তের শুরুতে লতা নামানোর কাজ সবচেয়ে সুবিধাজনক।

সেচ ঃ

গরমের সময় একদিন অন্তর, শীতকালে ৩।৪ দিন অন্তর এবং বর্ষার সময় ৮।১০ দিন অন্তর মাটির অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া দরকার। বরোজের মাটি সবসময় সরস রাখা চাই। একসঙ্গে বেশী জল দেওয়া উচিত নয়। এতে গাছের গোড়ার জল বসে পচে যেতে পারে। সেচের জল আধঘণ্টার বেশী জমিতে না দাঁড়িয়ে থাকে সেটা দেখতে হবে। সকালের দিকে সেচ দেওয়া উচিত।

বাজ দেওয়ার (অর্থাৎ লতার কুণ্ডলীর উপর মাটি চাপা দেওয়া) পর কয়েকদিন পরপর সেচ দেওয়া দরকার। আবার গাছ খুব লম্বা এবং তেজী হয়ে গেলে কয়েকদিন অন্তর অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। তবে কতদিন পরে পরে সেচ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকৃতি এবং মাটিতে রসের অবস্থার উপর। তাছাড়া ঋতু এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে সেচের ব্যবস্থা করা দরকার।

পান তোলা ও ফলন ঃ

ঠিকমত যত্ন ও পরিচর্যা করলে চারা লাগানোর চার থেকে ছয় মাস পর থেকেই পান তোলা যেতে পারে। স্থানবিশেষে পান তোলার জন্য বরোজ তৈরী হতে সময় লাগে এক থেকে তিন বছর। প্রথম বছরে স্বভাবতঃই পাতার আকার ছোট এবং সংখ্যাও অল্প হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বছর থেকে পাতার আকার এবং সংখ্যা দুই বৃদ্ধি পায়। জ্যৈষ্ঠমাস থেকে ভাদ্রমাস পর্যন্ত পানগাছের বাড়ন্ত সময়। কাজেই এই সময়ে পাতার

সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে, আর এই কারণেই এই সময়টায় বাজারে পানের দাম কম থাকে।

প্রতিটি গাছ থেকে বছরে তিন থেকে পাঁচবার পান তোলা হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রতি বিঘা বরোজ থেকে বছরে ২৫।৩০ লক্ষ পান পাওয়া যায়।

গাছ পান

স্বাভাবিক পরিবেশে যে পানগাছ অপর কোন বড়গাছকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে তাকে গাছ পান বলা হয়ে থাকে। গাছ পান পশ্চিমবাংলার সর্বত্র দেখা যায় না। প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গে বাস্তুকৃষি হিসাবে এই পানের চাষ করা হয়ে থাকে।

গাছ পানের পাতা পুরু ও ভঙ্গুর হয়, খেতেও দেশী পানের মত সুস্বাদু হয় না। এই পান চাষে বরোজ তৈরীর প্রয়োজন হয় না। আম, কাঁঠাল, সুপারি ইত্যাদি গাছকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে। কাজেই ঐ ধরনের বড় গাছের কাছে গাছ পানের চারা রোয়া হয়ে থাকে।

গাছ পানের লতার ডগা এবং পুরানো গাছের শিকড়জাত "ফেক্ড়ি" থেকে চারা তৈরী হয়। পৌষ-মাঘ মাসে কোন বড় গাছের কাছে ১ × ১ × ১ হাত গর্ত করে, গর্তের মাটির সঙ্গে গোবর সার আর কাঠের ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখা হয়। পরে বর্ষার শুরুতে ঐ গর্তে চারা রোয়া হয়ে থাকে। চারা রোয়ার পর বর্ষা শুরু হতে দেরী হলে অল্প অল্প সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারা লেগে যায়। এবং নূতন পাতা বের হতে শুরু করে আর লতাও বাড়তে

সংলগ্ন বা তার উপরের গাঁট থেকে শিকড় বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আক্রান্ত লতার পাতা ঢলে পড়ে যদিও বোঁটা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। লতার রং হলদেটে হয়ে যায়; কচি ডগা শুকাতে শুরু করে। ঢলেপড়া পাতার বোঁটায় বা বোঁটা সংলগ্ন স্থানে কোন কাল দাগ অবশ্য দেখা যাবে না। আক্রান্ত লতাকে সামান্য জোড়ে টান দিলেই গাছ উঠে আসে, মাটির নীচেকার কাণ্ড ও শিকড় পচতে শুরু করে।

আক্রমণকারী ছত্রাক মাটিতে অবস্থান করে এবং শিকড়ের মধ্য দিয়ে গাছকে আক্রমণ করে। প্রথমে মাটির নীচের লতা পচতে শুরু করে। ফলে গাছের মধ্যে রস চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ডগা, পাতা ঢলে পড়ে। মাটির উপরের লতাতেও আক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়। লতার গাঁটে এবং ডাঁটায় কাল দাগ দেখা যায়। বর্ষাকালে এই কাল দাগ ডাটার সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় মাটি চাপা দিলে আক্রান্ত অংশে পচন শুরু হয় এবং লতা মরে যায়। মাটি চাপা না দিলেও আক্রান্ত অংশ পচতে শুরু করে এবং লতা মরে যায়।

বর্ষার শুরুতে এই রোগের আক্রমণ তীব্র হলেও সারাটা বর্ষাকাল আক্রমণ সমানভাবে চলে, আর ক্ষতিও বেশী হয়ে থাকে।

প্রতিকার :

ফাইটপথোরা-জনিত গোড়াপচা ও ঢলেপড়া রোগের হাত থেকে বরোজের পান গাছকে রক্ষা করতে হলে রোগনাশক ওষুধ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা দরকার। ফাইটপথোরার আক্রমণ প্রতিরোধে তামাঘটিত ওষুধ বিশেষ কার্যকারী। তাই কপার অক্সিক্লোরাইড, যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোল্যান, ব্লুকপার ইত্যাদি প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে

মিশিয়ে এই মিশ্রণ পাতা, ডাঁটার সর্বত্র স্প্রে করা দরকার। সবচেয়ে ভাল বোর্দোমিশ্রণ।

বোর্দোমিশ্রণ তৈরী পদ্ধতি ঃ

বোর্দোমিশ্রণ তৈরী অবস্থায় পাওয়া যায় না, তৈরী করে নিতে হয়। একবিঘা মাপের বরোজের জন্য লাগবে এককেজি তুঁতে, এককেজি দুইশত পঞ্চাশ গ্রাম ভাল পাথুরে চুন, একশত লিটার জল। আর মিশ্রণ তৈরীর জন্য লাগবে তিনটি বড়মাপের কাঠের বা মাটির গামলা। আগের দিন বিকেলবেলায় পঁচিশ লিটার জলে একটি বড় গামলায় এককেজি তুঁতে গুঁড়ো করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন সকাল-বেলায় আর একটি গামলায় পঁচিশ লিটার জলে চুন ভিজাতে হবে। চুনটাকে মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে নেড়ে দিতে হবে যাতে সবটা চুন জলে গুলে যায়। সবটা চুন না গুলে গেলে পাতলা নেকড়া বা গামছায় চুনগোলা জলকে তিন নম্বর গামলায় ছেঁকে নিতে হবে। এরপরে চুনগোলা জলের মধ্যে তুঁতে গোলাজল ধীরে ধীরে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে কাঠি দিয়ে নাড়তে হবে যাতে দুটো জল ভালভাবে মিশে যায়। পরে ঐ মিশ্রণের মধ্যে আরো পঞ্চাশ লিটার পরিষ্কার জল মিশিয়ে মোট মিশ্রণকে একশ লিটার করতে হবে।

বোর্দোমিশ্রণের রং হবে নিলচে, কিছুটা থক্‌থকে ও আঠালো। মিশ্রণ তৈরী হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই গাছে ছিটাতে হবে। যত দেরী হবে মিশ্রণের কার্যকারিতা ততোই কমে যাবে।

গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষা শুরু হওয়ার মুখে, লতা নামানোর অন্ততঃ দু সপ্তাহ আগে পানপাতা তুলে নিয়েই ওষুধ স্প্রেয়ারের সাহায্যে লতার

সর্বত্র ভালভাবে ছিটাতে হবে। মাটিতে নামিয়ে রাখা লতার কুণ্ডলীতেও ভালভাবে ওষুধ ছিটাতে হবে। মাটিতে নামিয়ে রাখা লতায় ওষুধ ছিটানোর আগে ভুল করেও যেন মাটি চাপা না দেওয়া হয়। এমন কি নামিয়ে রাখা লতায় ওষুধ ছিটানোর ২/১ দিন পর মাটি চাপা দেওয়া দরকার। লতার কুণ্ডলীতে ওষুধ ছিটানোর সময় লতার গোড়ায় এবং গোড়ার চারপাশের মাটিতেও ওষুধ ছিটানো প্রয়োজন।

বর্ষা শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে ওষুধ ছিটানো খুবই প্রয়োজন।

স্কেরোসিয়াম-জনিত গোড়াপচা রোগ ঃ

অনেক স্থানে এই রোগকে 'গেদি' বা 'মেছুয়া' রোগ বলে। পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই এই রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠের গোড়া থেকে শ্রাবণের প্রথম পর্যন্ত এই রোগের আক্রমণকাল। পরে বাতাসের তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে রোগের ব্যাপকতা হ্রাস পায়।

আবহাওয়া গরম ও স্যাঁতসেঁতে থাকলে মাটি সংলগ্ন এবং নীচের লতায় এই রোগের আক্রমণ শুরু হয়। রোগ আক্রমণের সাথে সাথে মাটির নীচের লতা পচতে শুরু করে। লতার যেখানে পচন শুরু হয় তার ঠিক উপরেই সাদা সুতো বা তুলোর আকারে ছত্রাকের আবরণ দেখা যায় এবং ঐ সাদা আবরণের মাঝে মাঝে ছোট ছোট সরষের দানার মত স্কেরোসিয়াম বা ছত্রাকের বীজ দেখা যায়। এগুলো শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং ঐ থেকে পুনরায় রোগ আক্রমণ শুরু হয়।

আক্রমণের লক্ষণ ঃ পানপাতা ফ্যাকাসে বা হলদেটে হয়ে যায়

এবং ঝরে পড়ে। শেষে গোটাগাছ ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে যায়। তবে অন্যান্য গোড়াপচা রোগের মত এই রোগ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় না।

রোগ-বিস্তার পদ্ধতি ঃ এই রোগের বীজ মাটিতেই অবস্থান করে। কাজেই কোন রোগাক্রান্ত বরোজের মাটি কোদাল, লাঙ্গল বা অন্য কিছুর মাধ্যমে রোগাক্রান্ত বরোজ থেকে অন্য কোন বরোজ তৈরী হবে এমন জমিতে পড়লেই সেখানে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। অনেক সময় সেচের জলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়াতে পারে। পান ছাড়া অন্য অনেক ফসলে স্ক্লেরোসিয়ামজনিত রোগ হতে দেখা যায়। কাজেই বরোজে যে কোন আগাছা সম্বন্ধেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এছাড়া অন্য কোন স্ক্লেরোসিয়ামজনিত রোগাক্রান্ত ফসলের অংশ, যেমন পাটকাঠি, বরোজে প্রবেশ যাতে না করে সেদিকে কড়া নজর রাখা দরকার।

প্রতিকার ঃ

বরোজে এই রোগে আক্রান্ত গাছ দেখা গেলে, সাবধানে কিছুটা গোড়ার মাটি সমেত সম্পূর্ণ গাছ মাটি থেকে তুলে বরোজের বাহিরে পুড়িয়ে ফেলা দরকার। তা সম্ভব না হলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। গর্তের মধ্যে কিছুটা চুন মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। গাছ তোলার সময় সাবধান হতে হবে যাতে রোগের বীজ কোনভাবে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে। ভাল হয় যদি চট বা কাপড় দিয়ে গোড়ার মাটি সমেত রোগাক্রান্ত গাছটিকে জড়িয়ে বরোজের বাহিরে নিয়ে আসা হয়। এতে রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

এই রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক বা এর জীবাণু মাটির বেশী নীচে বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং বরোজে আক্রান্ত লতার গোড়ায় বেশী

করে মাটি ধরিয়ে দিলে, অন্ততঃ (২২—২৫ সেমি উঁচু) রোগের প্রকোপ কম হবে। বরোজে জৈবসার, যেমন কম্পোষ্ট, গোবর সার, খৈল বা সবুজসার, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করলে এই রোগের প্রকোপ কমে। এছাড়া ছত্রাকনাশক বিষ হিসাবে ২০ থেকে ৩০ কেজি ব্রাসিকল ২০% গুঁড়া এক একর বরোজে পানগাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে এবং প্রয়োগের পরেই অল্প পরিমাণ জল গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ব্রাসিকল ৭৫% জলে গোলা গুঁড়া প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে দিলেও রোগের প্রকোপ এবং বিস্তার রোধ করা যায়। জমিতে কাটিং বসানোর আগে কাটিং বসানোর স্থানের মাটিতে কিছুটা ব্রাসিকল ২০% গুঁড়া মিশিয়ে লাগালেও কম খরচে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

পাতা-পচা রোগ ঃ

বর্ষাকালে যখন বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি-বাদল এবং আবহাওয়া ভ্যাপসা ধরনের চলতে থাকে তখন পানের পাতায় পচন রোগ দেখা যায়। আক্রমণের সূচনায় পাতায় গোলাকার কাল বা গাঢ় বাদামী রঙের ভেজা দাগ দেখা দেয়। এই দাগগুলি খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং দুই একদিনের মধ্যেই পাতার প্রায় অর্ধেক অংশে দাগ ছড়িয়ে পড়ে। যদি বৃষ্টি হতে থাকে এবং আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে থাকে তবে আক্রান্ত অংশ পচে যায়, এমন কি গোটা পাতাই পচে যেতে পারে। পাতার বোঁটাতেও পচন ধরে এবং শেষ পর্যন্ত কাণ্ডে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় রোগের আক্রমণ পাতার শিরার মাধ্যমে অগ্রসর হয়, পাতার প্রধান শিরা ও উপশিরাগুলি কালো হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা উলটে দেখলে রোগের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

যদি আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুকনো থাকে তা হলে সাধারণতঃ পচন শুরু হয় না, তবে পাতা কোঁচকানো বা ঢেউখেলানো হয় এবং পাতার ধারগুলি কাল হয়ে যায়। পাতা আকারে ছোট হয় এবং আকৃতিতে বিকৃতি ঘটে। সাধারণতঃ নীচের পাতাতেই রোগ আক্রমণ বেশী হয়।

গোড়া পচা রোগের কারণ যে ছত্রাক, সেই ছত্রাকই পাতা পচা রোগর কারণ। যে সব বরোজে গোড়াপচা রোগ থাকে সেখানেই পাতা পচা রোগের প্রকোপ এবং বিস্তার বেশী। কাজেই ক্ষতির পরিমাণও বেশী। অনেক সময় বরোজে গোড়া পচা রোগ না হলেও পাতা-পচা রোগ দেখা যায়। পাতা-পচা রোগে আক্রান্ত বরোজের আপাত সুস্থ পান বিপননের সময় বাণ্ডিলের মধ্যে বা গুদামজাত অবস্থায় পচতে পারে ; কাজেই ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়। বিশেষ করে গুদামজাত অবস্থায় পাতা পচে যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

প্রতিকার ঃ

ফাইটপথোরা-জনিত পাতা-পচা রোগ প্রতিরোধ করতে হলে তামা-ঘটিত রোগনাশক ওষুধ বিশেষ কার্যকরী। কপার অক্সিক্লোরাইড, যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলীন ইত্যাদি, কিংবা বোর্দোমিশ্রণ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতিলিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে জলে গুলে পাতায়, ডাঁটায় স্প্রে করতে হবে। ওষুধ গোলা জল গাছের সর্বাঙ্গে ভালভাবে ছিটাতে হবে। বোর্দোমিশ্রণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

পাতায় দাগধরা রোগ ঃ

এই রোগ পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই হতে দেখা যায়। কোন কোন

স্থানে এই রোগ "চিত্রা" বা "আঙ্গারী" রোগ নামে পরিচিত। কলিটোট্রিকাম গোত্রীয় ছত্রাক এই রোগের কারণ।

লক্ষণ ঃ এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার খানিকটায় কালো রঙের ভেজা ভেজা দাগ দেখা যায়। দাগ পাতার যে কোন জায়গায় দেখা দিতে পারে, আকার ও আয়তনও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কালো বা বাদামী রঙের চারপাশে হাল্কা হলুদ রঙের আবেষ্টনী দেখা যায়। একটি পাতায় একাধিক দাগ দেখা যেতে পারে। লতার নীচের দিকের পাতায় প্রথম এই রোগ দেখা দেয়, পরে আস্তে আস্তে উপরের পাতায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভ্যাপসা থাকলে এই রোগ লতাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। লতা বা কাণ্ডে আক্রমণ হলে কাণ্ডের সবুজ ত্বকের নীচে গোলাকার ছোট ছোট দাগ লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে ত্বকেই কালো লম্বা দাগ রূপে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আবহাওয়া আর্দ্র হলে দাগগুলি লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি ভাবে খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। তবে লম্বা দাগগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। ফলে কিছুদিন পরে দাগগুলি লম্বাকৃতি হয় এবং কাণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। দুই বা তার বেশী দাগ একত্রে জোড়া লেগে ডাঁটাটিকে ঘিরে ফেলে এবং ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে। ফলে আক্রান্ত স্থানের উপরের লতা শুকিয়ে যায়; আক্রান্ত স্থানে গর্ত তৈরী হয় এবং অনেক সময় দাগে ফাটল দেখা দেয়। ফাটল থেকে বিন্দুর আকারে আঠা বের হতে থাকে। বর্ষার শুরু বা শেষে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও সারা বছর একে বরোজে দেখা যায়। অবশ্য শীতের সময় খুব কম থাকে।

প্রতিকার ঃ

এই রোগের জীবাণু মূলতঃ আক্রান্ত লতাতেই থাকে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বর্ষা শুরু হওয়ার আগে তাম্রঘটিত ওষুধ, যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোল্যান, ব্লু-কপার ইত্যাদি প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া জাইরাম ৮০% জলে গোলা ওষুধ প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে, কুমান এল্ প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি লিটার হিসাবে, অথবা ব্যাভিষ্টিন প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে পাতায় ডাঁটায় স্প্রে করা দরকার। রোগের তীব্রতা অনুসারে ২০ দিন অন্তর ২।৩ বার স্প্রে করা দরকার হতে পারে।

ছাতাধরা রোগ ঃ

রোগাক্রান্ত গাছের পাতার নীচে সাদা বা বাদামী রঙের ছাতাধরা ছোপ দেখা যায়। প্রথমে পাতার নীচে রোগের লক্ষণ দেখা দিলেও পরে পাতার উভয় দিকে রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়, এর ফলে পাতা হলদে হয়ে যয় এবং অল্পে ভেঙ্গে যায়। লতার ডগের দিকেও এই রোগ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে পুরোনো বরোজে এই রোগের প্রকোপ বেশী হয়ে থাকে। স্বভাবতঃই এই রোগের আক্রমণের ফলে পান পাতার মান কমে যায় ; আর দামও কম পাওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ

এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে গন্ধক গুঁড়া, ব্যাভিষ্টিন বা ক্যারোলেন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের যে ব্যবস্থার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হ'ল এগুলি ছাড়াও রোগের প্রকোপ প্রশমনের জন্য অন্যান্য আরও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে।

পানের রোগ সাধারণতঃ আক্রান্ত লতার মাধ্যমে নূতন বরোজে আসে এবং আক্রান্ত কাটিং-এর ব্যবহার রোগের সূচনা করে। এই কারণে নূতন বরোজে পান চাষ করার সময় কাটিং এমন বরোজ থেকে সংগ্রহ করা দরকার যেখানে রোগ নেই বা খুব কম।

কাটিং নেবার একমাস আগে পাতায় ও লতায় তাম্রঘটিত ওষুধ বা বোর্দোমিশ্রণ ভালভাবে স্প্রে করা দরকার। পনের দিন অন্তর ছুবার স্প্রে করা ভাল। কাটিং সবসময় পুরানো লতার উপরের অংশ থেকে সংগ্রহ করা দরকার। সম্ভব হলে এমিসন ৬% প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে মাটির পাত্রে বা কাঠের পাত্রে রেখে কাটিং লাগানোর পূর্বে এই মিশ্রণে ১০ মিনিট ভিজিয়ে নিয়ে লাগালে রোগমুক্ত হয়। পরন্তু কাটিং লাগানোর পরে প্রথম অবস্থায় গোড়াপচা রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

অতিরিক্ত জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা দরকার। বরোজের আশে-পাশে জঙ্গল যেন না থাকে। বর্ষা আরম্ভ হবার আগেই রোগ প্রতিরোধক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষাকালে সুবিধা থাকলে বরোজের ছাউনী খানিকটা ফাঁক করে দিতে হবে যাতে কিছুটা হাওয়া চলাচল করতে পারে। লতা নামানোর আগে তাম্রঘটিত ওষুধ বা বোর্দোমিশ্রণ স্প্রে করা দরকার। মিশ্রণের মাত্রা যেন যথাযথ হয়।

পর্যাপ্ত জৈবসার, যেমন বাদাম বা তিল খইল প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি ধরানো দরকার। বরোজে বাবহারের জন্য পাটকাঠি বা শর জাতীয় গাছ রোদে ভাল করে শুকিয়ে গোড়ার দিক ০·৫% ব্রাসিকল ৭৫% দ্রবণে (প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম) ১৫ মিনিট ভিজিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা দরকার। প্রয়োজনে শীতকালেও ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

পানের পুষ্টিকর গুণ ঃ

পানে পুষ্টিকর গুণেরও অভাব নেই। পান পাতায় শতকরা হিসাবে প্রোটিনের পরিমাণ ৩.১ ভাগ, স্নেহজাতীয় পদার্থ ০.৮ ভাগ, শর্করার পরিমাণ ৬.১ ভাগ, খনিজ লবণ ২.৩ ভাগ থাকে। এ ছাড়াও থাকে ডায়াস্টেজ ও ক্যাটালেজ নামক উৎসেচক। ভিটামিন 'এ' এবং 'বি'-র পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। ভিটামিন 'সি'ও যথেষ্ট থাকে। প্রোটিনের মধ্যে মূল্যবান লাইসিন ও হিসটিডিন অ্যামাইনো এ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। পান পাতায় একধরনের তেলের প্রাচুর্যের জন্য সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়; পরিমাণ, বিভিন্ন পানে ০.৬ ভাগ থেকে ২.৭ ভাগ পাওয়া যায়।

পানের অর্থনৈতিক মূল্য ঃ

পান পাতার অর্থনৈতিক অবদান যথেষ্ট। ফলে পান চাষ বর্তমান ভারতবর্ষে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন অনেক কৃষি পরিবার আছে যাদের পান চাষই প্রধান উপজীবিকা। এছাড়া পানের ব্যবসায়ে অনেক লোক জড়িত। পান চাষে মূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে **একটি মাঝারী মাপের বরোজ থাকলে একজন কৃষিজীবী বেকার যুবক অনায়াসে মাসে ১৫০০ টাকা আয় করতে পারে।** কাজেই পান চাষের মাধ্যমে গ্রামের অনেক বেকার যুবকের মনে আশার আলো জাগতে পারে। শুধু বেকার-সমস্যা সমাধান নয়; উত্তরবঙ্গের মত দক্ষিণবঙ্গের মিঠা পানও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাজ্য, মধ্য এশিয়া, কেনিয়া, পাকিস্থান এবং বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় পানের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিম-বাংলার মিঠাপান ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

সুপুরির চাষ

কথায় বলে পান-সুপুরি, অর্থাৎ পান ও সুপুরি যেন হরিহর আত্মা। একটি হলে আর একটি চাই। এহেন সুপুরির চাষ আমাদের এই ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে, যেমন হচ্ছে পানের চাষ। মাঙ্গলিক উপচার হিসাবে হিন্দুর বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে ঐ উভয়বিধ পদার্থের ব্যবহার কারও অজানা নয়। প্রাচীনকালে পান ও গুবাক্ দিয়ে প্রীতিভাজনকে সম্বর্ধনা জানানোর রেওয়াজ ছিল। উড়িষ্যা এবং আসামে অবশ্য এখনও এই প্রথা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে কোথাও কোথাও বা শহরে এখনও নজরে পড়ে। সাধারণতঃ পানের সঙ্গে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য সুপুরির ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে।

সুপুরি ব্যবহারের প্রাচীনত্বের প্রমাণ সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন নামকরণে, যেমন—ক্রমুক্, পূগ্, পুগীফল, গুবাক্, খপুর ইত্যাদি। আর এর সার্বজনীন ব্যবহারের প্রমাণ, বিভিন্ন ভাষায় নামের উল্লেখ। যেমন—বাংলায়—সুপুরি, হিন্দীতে—গুয়া, সুপারি, ছোটী ; মহারাষ্ট্রে—সুপারি ; গুজরাটে—সোপারী ; কর্ণাটকে—অঠকেয় হেসরুবৃক্ষ ; তেলেগুতে—পোকাকায়া ; আরবীতে—কোবিল ; ফারসীতে—পোপিল ইত্যাদি। এর ব্যবহারের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ এই যে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর বিশদ গুণাগুণের উল্লেখ রয়েছে। আয়ুর্বেদে এর গুণাগুণ সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হলো—সুপুরি গুরুপাক, শীতবীর্য, রুক্ষ, কষায়, মোহজনক, অগ্নিদীপক, রুচিকর, মুখবৈরস্য, কফ্ ও পিত্তনাশক। কাঁচা সুপুরি গুরুপাক, অগ্নি ও দৃষ্টিশক্তি নাশক। সিদ্ধ করা সুপুরি ত্রিদোষনাশক। পাকা ও শুকনো সুপুরি বায়ুজনক। সুপুরি ফুল

কৃমিজনক, কষায়, গুরুপাক। ভিজা সুপুরি ত্রিদোষনাশক ও বলকর।

ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলে সুপুরির চাষ হয়ে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু স্থানে এর চাষ সম্ভব। বাংলাদেশের সর্বত্র এবং পশ্চিমবাংলায় ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলায় ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য জেলায় বাড়ি বা বাড়ি সংলগ্ন বাগানে সুপুরির গাছ যত্রতত্র দেখা যায়।

জলবায়ু ঃ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বাতাসের আর্দ্রতা বেশী সে সকল স্থানে সুপুরি গাছ ভাল জন্মায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, আবার সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানের জলবায়ু সুপুরি চাষের পক্ষে আদর্শ।

মাটি ঃ

জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ মাটি সুপুরি চাষে আদর্শ। গরমের সময় যেখানে মাটির অল্প নীচে গাছের শিকড় জলের সংস্পর্শে আসতে পারে সেখানেই সুপুরির চাষ ভালভাবে করা যায়। মাটি জলধারণ ও দ্রুত জলনিকাশি ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। খুব বেশী এঁটেল বা বালি মাটি ছাড়া প্রায় সব রকম মাটিতেই সুপুরি চাষ করা যেতে পারে। নদী, খাল, বিল, পুকুরের উঁচু পাড়ে সুপুরির গাছ নজরে পড়ে।

সুপুরির জাত ঃ

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ দু জাতের সুপুরির চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ বঙ্গের সর্বত্র 'বাংলা' সুপুরির চাষ হয়। এ জাতের গাছে ফুল আসে মাঘ-ফাল্গুন মাসে, ফল পাকে কার্তিক থেকে পৌষের মধ্যে। উত্তরবঙ্গে "দেশোয়ালী" অর্থাৎ স্থানীয় জাতের চাষ বেশী হয়। এর ফুল আসে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ; ফল পাকে ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যে। প্রায় প্রতিমাসে নূতন নূতন কাঁদি আসে এবং বছরে ৫।৬ মাস ধরে ৫।৬ কাঁদি করে প্রতিগাছে সুপুরি হয়। বর্তমানে কেরালা থেকে আনা "মঙ্গলা" জাতীয় সুপুরি স্থানীয় সুপুরি থেকে আকারে বড়, গাছও অনেক তেজী, ফলনও বেশী। ফল তাড়াতাড়ি পাকে। জাতটি পশ্চিমবাংলার আবহাওয়ার উপযোগী। চন্দননগর কোকোনাট নার্শারী থেকে এই জাতের সুপুরির চারা পাওয়া যায়।

বীজ ও চারা তৈরী ঃ

বীজের জন্য গাছ পাকা এবং বড় আকারের সুপুরি বেছে নেওয়া প্রয়োজন। সুস্থ, সবল, মধ্যম বয়সী এবং বেশী ফলন দেয় এমন গাছ থেকে বীজের জন্য সুপুরি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। গাছের দক্ষিণদিকের সুপুরি বীজের পক্ষে ভাল। মাঘ-ফাল্গুন মাসে পাকা সুপুরি থেকে বীজের জন্য সুপুরি বেছে রাখা দরকার। পৌষ মাসে পাকা সুপুরি বীজের পক্ষে ভাল নয়। এতে চারা ভাল হয় না। গাছ থেকে সুপুরি পেড়ে ছায়াতে স্তূপাকার করে ১৫।২০ দিন ফেলে রাখলে খোসা পচে যায় এবং বোনার উপযুক্ত হয়।

বীজতলার জমি একটু উঁচু হওয়া চাই, সঙ্গে জলনিকাশি ব্যবস্থা ভাল হওয়া দরকার। মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। দশ

ইঞ্চি অন্তর বীজগুলিকে মুখ উপর দিকে রেখে এক ইঞ্চি গভীরে লাইন করে বসানো হয়। বীজ বোনার পরে ঝুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। চারা বের হতে ৫০।৬০ দিন সময় লাগে। চারা বীজতলায় রাখা হয় দুবছর।

সুপুরির বাগান তৈরী ঃ

ছোট অবস্থায় সুপুরি গাছ প্রবল বাতাস বা সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে পারে না। কাজেই সুপুরির চারা বসানোর আগে সুপুরি বাগানে অন্য ছায়া যুক্ত গাছ তৈরী করে নেওয়া দরকার। এর জন্য সুপুরি বাগান পূর্বেই নির্দিষ্ট করে নিয়ে চাষ-মই-সার দিয়ে তৈরী করে অর্থকরী ফসল কলাগাছ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য ছায়াযুক্ত গাছ যেমন মাদার লাগানো যেতে পারে। তবে যে গাছই লাগানো হোক সুপুরির চারা বসানোর আগে জমিতে সুপুরির চারার জন্য উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

মাদার গাছ লাগাতে হলে চারহাত মাপের মাদার ডাল আট হাত অন্তর বসাতে হয়। মাদার গাছ সুপুরি গাছে সারের যোগানও দেয়। সুপুরি বাগানের চারধারে বড় বড় গাছ, যেমন আম, জাম, নারকেল গাছ, প্রবল বাতাস আটকানোর জন্য লাগানো উচিত। প্রথম লাগানো সুপুরি গাছ বড় হয়ে গেলে মাঝের মাদার বা কলাগাছ তুলে ফেলে সেখানে নূতন করে সুপুরি গাছ লাগানো যেতে পারে।

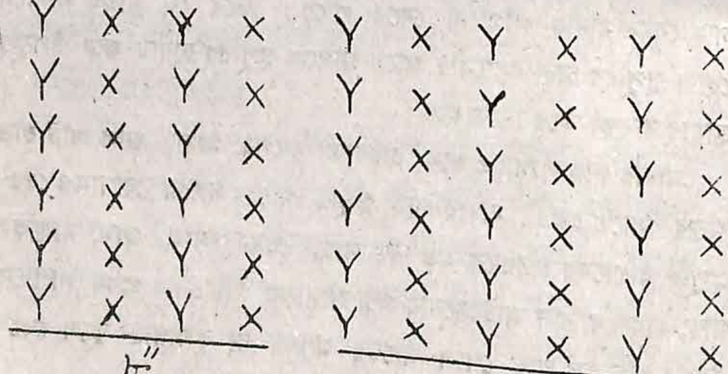
চারা বসানো ঃ

চারা বসানোর মাসখানেক আগে ৮ ফুট অন্তর সারি করে এবং সারিতে ৮ ফুট অন্তর দেড়হাত লম্বা, দেড়হাত চওড়া এবং দেড়হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে গর্তের মধ্যে শুক্‌নো পাতা, খড় ইত্যাদি দিয়ে জ্বালিয়ে

দিলে গর্তের ভেতরটা শোধন হয়ে যায়। এরপর গর্তের মাটির সঙ্গে পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার দশ কেজি পরিমাণ মিশিয়ে, চারা বসানোর আগে, ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত খালি রেখে, বাকীটা ভরাট করে দিতে হবে। গর্তের ঠিক মাঝখানে সোজা করে চারা বসাতে হয়। পরে চারার গোড়ার মাটি হাত দিয়ে চেপে শক্ত করে দিতে হয়। দু বছরের চারা রোয়ার উপযুক্ত। চারার বয়স তিন বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়।

অন্য আর একভাবে চারা বসানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ১২ ফুট দূরে বর্গাকারে চারটি চারার মাঝখানে আর একটি চারা বসানো হয়ে থাকে।

চারা বসানো জমির নক্শা ঃ



Y ঃ ছায়াযুক্ত গাছ ; X ঃ সুপুরি গাছ

সার প্রয়োগ ঃ

মানব শিশুর যেমন সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, উদ্ভিদ শিশুরও তেমন ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত এবং সুষম

খাদ্যসার। তাছাড়া ভবিষ্যতে বেশী ফলনের আশা থাকলে গাছকে সুস্থ সবল করে তুলতেই হবে।

সার প্রয়োগের পদ্ধতি হলো গাছের গোড়া থেকে দেড়-দু ফুট দূরে ৯ ইঞ্চি গভীর এবং বেশ কিছুটা চওড়া, চারপাশে গোলাকার গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সার প্রয়োগ করা। সার প্রয়োগের পর ঝুরো মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিতে হয়।

কোন বয়সে কতটা সার ঃ

বছরে ফলন্ত গাছে—

১০/১২ কেজি সবুজ পাতা
১০/১২ কেজি পচা গোবর বা আবর্জনা সার
১০০ গ্রাম নাইট্রোজেন (২০০ গ্রাম ইউরিয়া)
৪০ গ্রাম ফসফরিক এ্যাসিড (২৫০ গ্রাম সিঃ সুপার ফসফেট)
১৪০ গ্রাম পটাস (২৮০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ্ পটাস)

পুরো সারটা বছরে দুবারে দিতে হবে। অর্ধেক অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বাকী অর্ধেক দক্ষিণবঙ্গে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে, উত্তরবঙ্গে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে।

ফলনের আগে—ফলন্ত গাছের জন্য দেয় সারের অর্ধেক, বছরে দুবারে ভাগ করে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগের সময় একই।

পরিচর্যা ঃ

সুপুরির বাগান সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এরজন্য কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা বেছে ফেলতে হবে। এর ফলে ফলন বেড়ে যাবে ১০ থেকে ২০ ভাগ। মাঝে মাঝে সেচ নালা পরিষ্কার

করে দিতে হবে। কচি চারাতে যাতে রোদের তাপ না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সেচ :

শীত ও গ্রীষ্মকালে বাগানের মাটিতে রসের টান থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত সেচের জল নিকাশের ব্যবস্থা আগেই করে রাখতে হবে। কোন সময়েই সেচের জল আধঘন্টার বেশী গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে যেন না থাকে। বছরের এই সময়টায় ৮/১০ দিন অন্তর সেচ দিলেই চলে।

সুপুরি বাগানে সাথী ফসল :

উপযুক্ত যত্ন নিলে সুপুরি বাগানে কলা, পেঁপে, পান, আনারস, গোল-মরিচ প্রভৃতি ফসলের চাষ করা যেতে পারে। ঝড়ে যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য বাগানের চারধারে বড় মাপের গাছ লাগানো দরকার। প্রথম তিন-চার বছর সাথী ফসলের চাষ করার কোন অসুবিধাই নেই।

ফল সংগ্রহ :

চারা রোয়ার ৫।৭ বছর পরে ফল ধরতে শুরু করে। ফল পাকতে সময় নেয় ৯।১০ মাস। আবার ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে গাছে ফুল বা কাঁদি পড়ে। ফল পাড়ার সময় দড়ি দিয়ে কাঁদিগুলি আস্তে আস্তে নামিয়ে নিতে হয়। তা না হলে পাকা সুপুরিতে আঘাত লাগতে পারে। আঘাত লাগা সুপুরি পচে যেতে পারে।

ফলন :

সুপুরি গাছ শতায়ু হয়ে থাকে। প্রথম বয়সে গাছে অল্প ফল ধরে। ২০ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বেশী ফল দেয়। পঞ্চাশের পরে গাছ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে, ফলনও কমে যায়। তবে ফলন

অনেকটাই নির্ভর করে পরিচর্যার উপর। এক একবারে সাধারণতঃ ২।৪টি কাঁদি ধরে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিগাছ থেকে ১৫০।২০০টি সুপুরি পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণ উপকূলে ফলন কিছুটা বেশী। বছরে প্রতি গাছ থেকে ৩০০।৩৫০টি ফল পাওয়া যায়। গাছের সংখ্যা একরে ৪৫০।৫০০ হলে গড়ে ৮।১০ কুইন্টাল সুপুরি পাওয়া যেতে পারে।

পণ্যোপযোগীকরণ ঃ

পাকা সুপুরি কাঁদি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'টুকরো করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ এবং আসামে পাকা সুপুরি ৩।৪ মাস ধরে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, পরে বাজারে বিক্রি করা হয়। একে স্থানীয় ভাষায় বলে মজাগুয়া। কাঁচা সুপুরি বিক্রি করার প্রয়োজন হলে সুপুরিগুলিকে চাক চাক করে কেটে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পাকা সুপুরি শুকানো হয় গোবর দিয়ে নিকানো উঠানে বা খামারে। একটা একটা করে বিছিয়ে সুপুরি রোদে শুকানো হয়। সুপুরিগুলিকে মাঝেমাঝে নাড়াচাড়া করা হয় যাতে সবদিক সমানভাবে সূর্যের তাপ পায়। শুকিয়ে গেলে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কোথাও কোথাও বা গাছ থেকে সুপুরি পেড়ে খোসাশুদ্ধ জলে সিদ্ধ করে পরে শুকিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। কোথাও বা কাঁচা সুপুরি খোসা ছাড়িয়ে কয়েকদিন ধরে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এতে সুপুরির কস্ সুপুরির গায়ে লেগে যায়, ফলে সুপুরিগুলি দেখতে হয় চমৎকার। পরে শুকিয়ে 'মঘাই' সুপুরি নামে বাজারে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

সুপারি গাছের রোগ এবং তার প্রতিকার ঃ

যে রোগগুলি সুপুরি গাছ এবং ফলের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে থাকে এমন কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

ফলপচা ঃ

এই রোগকে কোন কোন স্থানে 'মাহলি' রোগ বলে। এই রোগটি সুপুরি গাছের পক্ষে খুবই মারাত্মক। জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে এই রোগ সাধারণতঃ হয় না, অথবা হলেও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে না। আক্রান্ত গাছে ফল ও পাতার কুণ্ডলি বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সুপুরি ঝড়ে পড়ে।

এই রোগ দমনের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথমে ১% বোর্দোমিশ্রণ ৪০-৪৫ দিন পরে পরে দুবার ভাল করে গাছে ছিটাতে হবে। বর্ষা শুরু হবার আগেই ওষুধ ছিটানো শেষ করা উচিত।

পাতা হলদে হওয়া ঃ—

এই রোগে সুপুরি গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় এবং সুপুরির ভেতরের অংশ বাদামি রঙের হয়ে খাবারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। রোগের কারণ জানা না গেলেও এটা দেখা গেছে যে বাগানের পরিচর্যা ঠিকমত না হলে এই রোগ দেখা দেয়।

রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বাগান পরিষ্কার রাখা, জল-নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা দরকার।

রোদে ঝল্‌সানো ঃ

সুপুরি বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রোদ আটকানোর ব্যবস্থা না করলে গাছের কাণ্ড নিজস্ব আকার পরিবর্তন করে চওড়া হয়ে যায় এবং ঝোড়ো হাওয়াতে ভেঙ্গে পড়ে।

প্রতিকার হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং লম্বা হয় এমন গাছ লাগানো দরকার।

মোচা শুকিয়ে যাওয়া ও কুঁড়ি ঝরা ঃ

মোচা শুকিয়ে গেলে সুপুরির কুঁড়ি বা গুটি ঝরে যায়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। ডগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মোচা শুকিয়ে বাদামী হয়ে যাওয়া এবং গুটি ঝরে পড়া এই রোগের লক্ষণ। পরে মোচায় গোলাকার ছিট ছিট দাগ দেখা যায়। কোন একগাছ থেকে অন্যগাছে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত মোচা কেটে পুড়িয়ে ফেলা দরকার। এ রোগ দমনের জন্য প্রতিলিটার জলে চার গ্রাম ডাইথেন জেড-৭৮ ওষুধ জলে গুলে দু-বার গাছে ছিটাতে হয়। প্রথমে মোচা খোলার পরেই এবং দ্বিতীয়বার মোচা খোলার ২৫।২৮ দিন পরে।

কীটশত্রু ঃ

সুপুরি বাগিচা পরিষ্কার না রাখলে রোগের মত কীট শত্রুর দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কীটশত্রুর মধ্যে যেগুলি বিশেষ ক্ষতিকারক তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

মাকড় ঃ

সব বয়সের সুপুরিগাছই সাদা, হলদে ও লাল মাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এরা পাতার পিছনদিকে দল বেঁধে থাকে ও পাতার রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা প্রথমে হলদে, পরে তামাটে রঙ ধারণ করে এবং শেষে শুকিয়ে যায়। শুকনো ও গরম আবহাওয়ায় মাকড়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার হিসাবে নিম্নলিখিত যে-কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
থায়োডেন ৩৫%	১ মিলিলিটার (হলদে মাকড়ের জন্য)
কেলথিন ১৮·৫%	২ „ (লাল মাকড়ের জন্য)
মোরোসাইড ৪০%	১ „ „
নুভাক্রন ৫০%	১ „ (উভয়প্রকার মাকড়ের জন্য)

ডগা ছিদ্রকারী শোষক পোকা :

বর্ষার শেষে ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে নূতন পাতার কুণ্ডলীর মধ্যে বাস করে এবং পাতার রস শোষণ করে। ফলে কুণ্ডলী খুলতে পারে না। পাতা দুমড়ে ছোট হয়ে যায়। আক্রমণ বেশী হলে গাছ মরে যেতে দেখা যায়।

প্রতিকার হিসাবে এনডোসালফন ৩৫% প্রতি ১০০ লিটার জলে ১২৫ মিলিলিটার ওষুধ মিশিয়ে গাছের ডগায় ভালভাবে ছিটাতে হবে। বি. এইচ. সি. ৫০% ১০০ লিটার জলে ২৫০ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমবার ব্যবহারের পর দ্বিতীয়বার আক্রমণ (রোধের জন্য ৩০।৩৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটান দরকার।)

ফুলের লেদা পোকা :

এদের পূর্ণাঙ্গকীট মোচায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে শূককীট বেরিয়ে মোচার ভেতরে ঢুকে ফুল খেয়ে ফেলে এবং মোচাকে রেশমের সুতোর মত সুতো দিয়ে জড়িয়ে দলা পাকিয়ে এর ভেতর বাস করে। আক্রান্ত মোচায় ফুল আসে না এবং মোচার গোড়ায় ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়।

প্রতিকার হিসাবে ১০০ লিটার জলে ১২৫ মিলিলিটার এনড্রিন ২০% অথবা ২৫০ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন ৫০% মিশিয়ে ছেটাতে হবে।

শেকড়ের ঘুরঘুরে পোকা ঃ

এই পোকার আক্রমণে গাছ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা প্রথমে নরম ও কচি শেকড় খেয়ে নেয়, শেষে শক্ত শেকড়ও বাদ দেয় না। এরা দেখতে অনেকটা ইংরাজি বর্ণমালার ইউ-এর মত ; পা বাদামি রঙের হয়। নীচু জমিতে এবং জল নিকাশি ব্যবস্থা ভাল না হলে এই পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

প্রতিকার হিসাবে ইনটক্স ৮% ১০০ লিটার জলে ৫০ মিলিলিটার গুলে সুপুরি গাছের গোড়ায় ঢেলে দেওয়া হয়। ওষুধ দেবার আগে গাছের গোড়া থেকে গোলাকারভাবে ১০।১৫ সেন্টিমিটার মাটি সরিয়ে নিতে হয়। একইভাবে প্রতি গাছে ৮ গ্রাম হিসাবে থাইমেট-১০জি দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বর্ষার আগে ও পরে ওষুধ দিলে পোকার আক্রমণ হয় না।

সুপরিচাষে অবশ্য করণীয় কাজ

* সুস্থ সবল গাছ পেতে হলে বীজ ভাল হওয়া চাই। সুস্থ সবল এবং বেশী ফলন দেয় এমন গাছ থেকে গাছপাকা বড় আকারের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

* যেসব চারার গোড়া মোটা, আকারে বেঁটে এবং পাতা বেশী সেগুলিই ভাল। যেসব বীজ তাড়াতাড়ি গজায় তাদের থেকেই ভাল চারা হয়।

* একটি নির্দিষ্ট ছক, অনুসারে চারা বসাতে হবে। এতে পরিচর্যার কাজ সহজ হয়, খরচ কম হয় এবং লাভ বেশী হয়।

* চারা বসানোর প্রথম দিকে চারার গোড়ায় জল যেন না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* সুপুরি বাগিচায় ছায়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। বাগান তৈরীর আগেই বাগানের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ছায়াযুক্ত বড় গাছ লাগিয়ে নিতে হবে। ছায়ার জন্য জলদি বাড়ে এমন গাছ লাগাতে হবে।

* গাছে নিয়মিত সার ও সেচ দিতে হবে। জলনিকাশি ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই। নিয়মিত ভাবে কোদাল দিয়ে হাল্কা ভাবে বাগানের মাটি কুপিয়ে দিলে ফলন বাড়ে।

* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগানে রোগ-পোকা কম হয়। কাজেই বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে।

* মোচা বের হলেই রোগ প্রতিরোধক ওষুধ ছিটাতে হবে।

* সুপুরি বাগানে ছায়ার জন্য শুঁটি জাতীয় গাছ, যেমন মাদার লাগানো ভাল। এছাড়া সবুজ সার হিসাবে শুঁটিজাতীয় ফসল চাষ করা মাটিতে মিশিয়ে দিলে ভাল হয়।

* সুপুরি বাগানে উপযুক্ত সাথী ফসল চাষ করতে ভুলবেন না।

* ভাল জাতের এবং ভালভাবে তৈরী সুপুরির বাজার দর বেশী। কাজেই বিক্রির জন্য সুপুরি তৈরীতে উপযুক্ত যত্ন নিন।